বিজ্ঞানকে তিনি নিছক গবেষণাগারের ক্ষুদ্র কোটরে বন্দি রাখতে চাননি। চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের সকল স্তরে, তা কাজে লাগুক সাধারণ মানুষের কল্যাণে। বিজ্ঞানের হাত ধরেই দেশ এগিয়ে চলুক প্রগতির লক্ষ্যে, বর্জন করুক যাবতীয় কুসংস্কার। এই মানুষটি হলেন মেঘনাদ সাহা, এ দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অন্যতম অগ্রপথিক। গতকাল ৬ অক্টোবর প্রায় নীরবেই চলে গেল তাঁর ১২৫ তম জন্মদিবস। গণেশের মাথার প্লাস্টিক সার্জারি কে করল, বা মহাভারতের যুগে সঞ্জয়ের বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ ছিল কিনা– এটাই যখন একালে 'বিজ্ঞান গবেষণার' বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে, তখনই মনে হয় মেঘনাদের আজ বড় প্রয়োজন।

কলকাতা। ১৯২০ সাল। শরতের সন্ধ্যায় নির্মেঘ আকাশের নীচে দাঁড়ালে মন যেমন একটা মুগ্ধতাবোধে আচ্ছন্ন হয়, এ সময়ের কলকাতার বুধমণ্ডলীর দিকে তাকালেও তাই। শরতের সন্ধ্যায় একদিকে যখন গ্রীষ্মের আকাশের উজ্জ্বল তারারা অস্ত যাওয়ার আগে পশ্চিম দিগন্তের কাছে ঝলমল করতে থাকে, পুব আকাশে তখন একে একে ফুটে ওঠে ব্রহ্মহৃদয়, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা। শীতের আকাশের মহারথীরা। পশ্চিম আকাশের দীপ্তির উত্তরাধিকার যেন নিখুঁতভাবে সঞ্চারিত হয় পুব আকাশে। আর দুই আকাশের মাঝবরাবর সেতুবন্ধন করে আলোর রেখা এঁকে যায় ছায়াপথ। যে সময়টার কথা বলছি, সে সময় ভারতের জ্ঞান–আকাশের অবস্থাটাও অনেকটা একই রকমের। পশ্চিম আকাশে তখনও জ্বলজ্বল করছেন জগদীশচন্দ্র বসু আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভারতের বিজ্ঞান আকাশের দুই প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। তেমনই পুব আকাশে আত্মপ্রকাশ করছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সি ভি রামন, মেঘনাদ সাহারা। আর এই দুই উজ্জ্বল প্রজন্মের মধ্যে ছায়াপথের মতো সেতুবন্ধনের কাজটা করছে শহর কলকাতা।

যে সময়ের কথা, রামন এফেক্ট আবিষ্কার হতে তখনও আট বছর বাকি, বোস–আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব আবিষ্কার হতে বাকি চার বছর। ১৯২০–র মার্চ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Philosopical Magazine–এ প্রকাশিত হল একটি পূর্ণদৈর্ঘের গবেষণাপত্র, শিরোনাম 'Ionization in the solar chromosphere'। মাসখানেক পরে একই শিরোনামে মূল গবেষণাপত্রটির সারসংক্ষেপ চিঠির আকারে প্রকাশিত হল বিখ্যাত Nature পত্রিকায়। চিঠির নীচে বিজ্ঞানীর নাম, M N Saha, University College of Science, Calcutta. হইচই পড়ে গেল বিজ্ঞানীমহল। শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপচারিতার ফাঁকে একদিন সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা জানো, মেঘনাদ কী করেছে? সে ঘরে বসেই নক্ষত্রদের তাপমাত্রা মেপে ফেলেছে!'

(২)

আমরা আমাদের আশপাশে যাবতীয় যা কিছু দেখি তার গঠনের মূলে রয়েছে পরমাণুর বিন্যাস। যদি আরও গভীরে যাই দেখতে পাই পরমাণুর কেন্দ্রে আঁটোসাঁটো হয়ে বসে রয়েছে কতকগুলো প্রোটন আর কতকগুলো নিউট্রন। প্রোটনের মাথায় ধনাত্মক তড়িতের বোঝা। নিউট্রন হাত–পা ছাড়া, তার মাথায় কোনওরকম তড়িতের বোঝা নেই। আর নিউট্রন ও প্রোটনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কেন্দ্রকের চারপাশে ঋণাত্মক তড়িতের বোঝা মাথায় নিয়ে পাগলের মতো অবিরাম পাক খেয়ে চলেছে কতকগুলো ইলেকট্রন। সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুর কেন্দ্রকে যতগুলো প্রোটন, তার চারপাশে ঠিক ততগুলোই ইলেকট্রন। যতটুকু ধনাত্মক বোঝা, ঋণাত্মক বোঝাও ঠিক ততটুকুই। সব মিলিয়ে পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ। তবে এ সবই সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায়। বাইরে থেকে শক্তির খোঁচা দিলে পরমাণু উত্তেজিত হয়। উত্তেজিত পরমাণু থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। এর ফলে পরমাণু তার তড়িৎ নিরপেক্ষতা হারায়। তার মাথায় চাপে ধনাত্মক তড়িতের বোঝা। তড়িতের মাথায় চাপলে পরমাণু আর পরমাণু থাকে না, তার নতুন নাম হয় আয়ন। পরমাণু আর আয়নের এই জ্ঞান নিয়ে আসুন আমরা এবার চোখ রাখি সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রদের ভিতর। নক্ষত্রের ভিতরের অস্বাভাবিক বেশি তাপমাত্রায় সব পরমাণু তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। তাপশক্তির প্রভাবে এই পরমাণুদের একটা বড় অংশ নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে আয়নিত হয়ে যায়। জন্ম নেয় আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন। এই মুক্ত ইলেকট্রন ওই ভয়ানক তাপমাত্রায় প্রোটন বা ধনাত্মক আয়নের মায়া কাটিয়ে স্বাধীনভাবে ভেসে বেড়ায় নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে। নক্ষত্রের আবহমণ্ডলের ঘনত্ব এতটাই কম যে ভেসে বেড়ানো মুক্ত ইলেকট্রনেরা এখানে সত্যিই মুক্ত, তারা নিজেদের মধ্যে স্থির তড়িতজনিত বিকর্ষণ বা আয়নের সঙ্গে স্থির তড়িতজাত আকর্ষণ, কোনওটাই অনুভব করে না। সব মিলিয়ে নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে এখন তিন রকমের পদার্থের উপস্থিতি। এক, স্বাভাবিক পরমাণু দিয়ে তৈরি উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাস। দুই, আয়নিত পরমাণুর মেঘ। তিন, মুক্ত ইলেকট্রনের মেঘ। নক্ষত্রের ভিতরের এই জগাখিচুড়ি দশাকে ভদ্র ভাষায় বলা হয় 'প্লাজমা'।

প্লাজমা অতি বিষম বস্তু। তার দুই রকমের ধর্ম। প্রথম ধর্ম বলছে সে আদতে একাধিক গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ। দ্বিতীয় ধর্ম অনুসারে তার পারমাণবিক স্তরে ঘটে গিয়েছে আমূল পরিবর্তন। মুশকিল হল এই যে, এই দু'টি ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে পারে বিজ্ঞানের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা। গ্যাসের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে চাই গ্যাস গতিতত্ত্ব। আর পারমাণবিক স্তরের ধর্ম ব্যাখ্যা দিতে অপরিহার্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কাজেই নক্ষত্রের অন্দরমহলের খবর পেতে হলে গ্যাস গতিতত্ত্ব আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাঁড়াশি আক্রমণ করাটা জরুরি ছিল। সেই জরুরি কাজটাই করে দেখিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছিলেন নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে উপস্থিত মোট পরমাণুর কতটা ভগ্নাংশে আয়নিত হবে আর কতটা অংশ তড়িত নিরপেক্ষ স্বাভাবিক পরমাণু হিসেবে থাকবে, তা নির্ভর করে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর। এক, নক্ষত্রের তাপমাত্রা। দুই, নক্ষত্রের আবহমণ্ডলের চাপ অথবা আবহমণ্ডলে উপস্থিত গ্যাসের ঘনত্ব। তিন, উপস্থিত গ্যাসের পরমাণু থেকে একটি একটি ইলেকট্রনকে ছিনিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ। এই ইলেকট্রন ছিনিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণকে বলা হয় আয়নন বিভব বা আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল। আয়নন বিভব প্রতিটি মৌলিক পদার্থের স্বকীয় ধর্ম। বিভিন্ন মৌলের আয়নন বিভবের মান এবং তাদের গণনার পদ্ধতি সম্পর্কেও মেঘনাদ সাহা তাঁর গবেষণাপত্রে বিশদে আলোচনা করেছেন। মোটের উপর ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, মেঘনাদ সাহার আবিষ্কৃত Saha ionization equation ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সূর্য বা বহুদূরের কোনও নক্ষত্রের থেকে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সেই নক্ষত্রের তাপমাত্রা এবং রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য জানতে সক্ষম হলেন। আবিষ্কারের প্রায় একশো বছর পরে আজকের দিনেও মহা দূরের কোনও নক্ষত্রের নাড়ির খবর জানতে 'সাহা সমীকরণ' সমানভাবে প্রয়োজনীয়।

তবে এখানেই থেমে থাকেননি মেঘনাদ। অধ্যাপনা আর গবেষণা চলতে লাগল সমান তালে। প্রথমে কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাঝে ১৯২৩ থেকে পনেরো বছর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর ১৯৩৮ থেকে ফের কলকাতায়। নিজ হাতে তৈরি করলেন অসংখ্য ছাত্র ও গবেষক। দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকল নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণাপত্র। সূর্য ও নক্ষত্রের বর্ণালী তো রইলই, পাশাপাশি তিনি মন দিলেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকের আয়নিত স্তরের দিকেও। যে স্তরের পোশাকি নাম আয়োনোস্ফিয়ার। ভারতে আয়োনোস্ফিয়ার বিষয়ে গবেষণার তিনি পথিকৃৎ।

(৩)

Scientists live in ivory tower. .'বিজ্ঞানীর দৌড় তো ওই গবেষণাগার পর্যন্ত। না আছে বাস্তবের সঙ্গে যোগ, না আছে সমাজ সম্পর্কে দায় দায়িত্ব'। দেশে দেশে, কালে কালে বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে এই একটি অপবাদ চলে আসছে। এ অপবাদ মেঘনাদ সাহাকেও শুনতে হয়েছে। তবে সত্যিই কি এ অপবাদ তাঁর ক্ষেত্রে সাজে?

একজন সঙ্গীতজ্ঞ যেমন চান সুর ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে, মানুষ গান করুক, গান শুনুক, ভালোবাসুক সুরকে। একজন বিজ্ঞানীও ঠিক তেমনই চান বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের কোনায় কোনায়। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানকে জানুক, ভালোবাসুক। মেঘনাদও চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন দেশে তৈরি হোক বিশ্বমানের পরিকাঠামো, দেশ এগিয়ে চলুক বিজ্ঞানের পথে। এলাহাবাদে থাকাকালীন গড়ে তুললেন United Provinces Academy of Sciences, India (UPAS) আর কলকাতায় ১৯৩৫–এ প্রতিষ্ঠা করলেন National Institution of Sciences. এই দু'টি সংস্থার বর্তমান নাম যথাক্রমে The National Academy of Sciences, India এবং Indian National Science Academy (INSA). বিজ্ঞানের প্রসারে এই দু'টি সংস্থার ভূমিকা আজও অমলিন।

এ তো গেল বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র স্থাপন। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারের কী হবে? এর জন্য ১৯৩৫ সালেই সূচনা করলেন আরও একটি সংস্থার, যার নাম Indian Science News Association (ISNA). এই সংস্থার প্রধান কাজই হল Science and Culture নামে মাসিক মুখপত্র প্রকাশ করা। এই মুখপত্রের মাধ্যমে অধ্যাপক সাহা বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক ও চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলোর খবর ভারতের বিজ্ঞানীমহল ও সাধারণ পাঠকের কাছে নিয়মিতভাবে পৌঁছে দিতে শুরু করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরও বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সঙ্গে। এর মধ্যে অন্যতম হল ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science (IACS). সাহা ছিলেন IACS এর প্রথম অধিকর্তা। ১৯৫৩ থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৩৯ সাল। জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান আবিষ্কার করলেন পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পদ্ধতি। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন কেন্দ্রক বিভাজনের বিক্রিয়ায় হারিয়ে যায় পদার্থের খানিকটা ভর, বিনিময়ে মুক্ত হয় অযুত শক্তি। এ যেন আইনস্টাইনের ভর–শক্তির তুল্যমূল্য সমীকরণের বাস্তব রূপ। বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওই অযুত শক্তি ব্যবহার করে বোমা বানাতে। আর একদল মাথা ঘামাতে শুরু করলেন কীভাবে সেই শক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে দেশের ও দশের কাজে লাগানো যায় সেই নিয়ে। মেঘনাদ সাহা ছিলেন দ্বিতীয় দলে। তিনি ভারতে একটি নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরির ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জওহরলাল নেহরু, সাহায্য করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক বাধা বিপত্তির পাহাড় ঠেলে জোগাড় হল প্রয়োজনীয় অর্থ।

একজন বিজ্ঞানীও চান বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের কোনায় কোনায়। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানকে জানুক, ভালোবাসুক। মেঘনাদও চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন দেশ এগিয়ে চলুক বিজ্ঞানের পথে